তৃতীয় অধ্যায়

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) :

বাংলা নাটকের প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে সামাজিক সমস্যাগুলি রঙ্গে-ব্যঙ্গে নাটকের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি পুরাতনের অনুবর্তনে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও অভিনয় বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রহসন রচনায় যেমন সিদ্ধহস্ত আবার সংস্কৃত নাটকের অনুবাদেও যথেষ্ঠ কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি সাহিত্য সাধনা শুরু করেছিলেন সংস্কৃত রচনার মাধ্যমে এবং জীবনের শেষ দশকে কেবল সংস্কৃত স্তোত্র ও গীতিকা রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। তাঁর সময়কালের মধ্যে আবির্ভূত মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র রামনারায়ণের প্রদর্শিত পথেই বাংলা নাটককে সৌখিনতার স্তর থেকে পেশাদারী স্তরে উন্নীত করেছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহিনী, বেলগাছিয়া, জোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটা -এই চারটি প্রধান সৌখিন নাট্যমঞ্চের জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন।

সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত রামনারায়ণের অনুদিত 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০) ও 'মালতী মাধব' (১৮৬৭) এই চারটি নাটকের মধ্যে দুটি নাটকই মহাভারত-কাহিনি অবলম্বনে রচিত। অনুদিত নাটকগুলির মধ্যে 'রত্নাবলী' অনেকাংশে মূলানুগত, অপর তিনটি নাটক বহুলাংশে স্বাধীন রচনা। তাঁর মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে 'রুক্মিনী হরণ' (১৮৭১) নাটকের বিষয়ও মহাভারত কেন্দ্রিক। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'কংসবধ নাটক' (১৮৭৫) ও 'ধর্মবিজয় নাটক' (১৮৭৫) এর সঙ্গে মহাভারতের সংযোগ মূলত পরোক্ষ। বাস্তব জীবনের রূপকার রামনারায়ণের সামাজিক নক্সা জাতীয় নাটক বা প্রহসনগুলি গুরত্বপূর্ণ হলেও বর্তমান গবেষণার সঙ্গে সম্পূরক নয়। 'বেণীসংহার', 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' ও 'রুক্মিনী হরণ' এই তিনটি নাটকই আলোচ্য গবেষণার উপজীব্য।

বেণীসংহার (১৮৫৬) :

বেণীসংহার নাটকের কাহিনি মহাভারতের উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্বের আখ্যানভাগ অনুসরণ করেছে। দীর্ঘ বনবাস অতিক্রম করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসার পর থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত এই নাটকের ব্যাপ্তিকাল। মহাভারত থেকে রামনারায়ণের নাটকের রূপান্তর মূলত পরোক্ষ। সংস্কৃত 'বেণীসংহারম্' নাটকে ভট্টনারায়ণ মহাভারতীয় কাহিনির যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন রামনারায়ণ তার অন্ধঅনুকরণ মাত্র করেন নি। ভট্টনারায়ণের নাটকের ভাষার গাম্ভীর্য ওজস্বিতাকে রামনারায়ণ চলিত বাংলায় রূপান্তর করে মহাকাব্যিক দূরত্ব লঙ্ঘন করেছেন যা উনিশশতকীয় বাঙালি দর্শকের রুচিবোধকে তৃপ্ত করে।

মহাভারত থেকে রামনারায়ণের নাটকের মধ্যবর্তী স্তরে ভট্টনারায়ণের নাটকের প্রতিতুলনায় 'বেণীসংহারম্' থেকে 'বেণীসংহার নাটকে' যে দ্বিস্তরের বিবর্তন ঘটেছে তা মূল আখ্যানভাগকে বহুবিধ মাত্রায় উদ্ভাসিত করে। দুটি নাটকের বিশ্লেষণে দেখা যায় সংস্কৃত নাটকের স্ফীত বর্ণনা বাহুল্য রামনারায়ণের নাটকে সরলীকৃত হয়েছে। মহাকাব্যিক চরিত্রগুলি লৌহবর্ম পরিত্যাগ করে রক্তমাংসের মানুষের মতো কথা বলেছেন। নাটকের প্রয়োজনে কতগুলি গৌণ চরিত্র সংস্কৃত নাটকে রয়েছে, রামনারায়ণ বাহুল্য বোধে তাদের কয়েকজনকে বর্জন করেছেন। দ্রোণের সারথি অশ্বসেন, ভানুমতীর সহচরী, কুন্তী, হিড়িম্বা, কুরুরাজ ইত্যাদি চরিত্র গুলি রামনারায়ণের নাটকে না থাকলেও নাট্য রসের ব্যঘাত ঘটেনি। মূল চরিত্র সমূহ প্রায় একই থাকলেও তাদের সংলাপের দীর্ঘতা কোথাও কোথাও খর্ব করেছেন বাঙালি নাট্যকার। নাট্যারম্ভে সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার ও তার সহায়ক বাংলা নাটকের স্বভাব অনুযায়ী অনুপস্থিত। ছয় অঙ্কের 'বেণীসংহারম্' পঞ্চমাঙ্কের কায়া ধারণ করলেও নাট্য ঘটনা সমূহ পরিবর্তীত হয়নি। ভট্ট নারায়ণের নাটক সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র তর্কতার্থ মন্তব্য করেছেন, ''কোন কোন অংশে নাটকীয় গতি দীর্ঘ সংলাপের দ্বারা ক্ষুন্ন হয়েছে। বর্ণনার অনাবশ্যক বিস্তার কোথাও কোথাও নাটকীয় আগ্রহ ব্যাহত করেছে। আতিশয্যের ফলে করুণরস ক্লান্তিজনক হয়ে পড়েছে, ভয়ানক রসও একটু যেন মাত্রারিক্ত।''[১]

মহাভারতের সভাপর্বে দ্যূত ক্রীড়ায় হেরে যাওয়ার পর দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে জোরপূর্বক সভায় টেনে এনে নারীত্বের চরম অবমাননা করলে যাজ্ঞসেনী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন না দুঃশাসনের বুক বিদীর্ণ করে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ না হয় ততদিন তিনি চুল বন্ধন করবেন না। এই কাহিনির সূত্র ধরেই পরবর্তী কালের নাট্যকারেরা নাটক রচনা করেছেন। মহাভারতের 'স্ত্রীপর্বে' দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা –

''ছিল মুক্ত কেশ মোর দ্বাদশ বৎসর।
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে সবার ভিতর।।
দুঃশাসন রক্ত আনি দিবে ভীমসেন।
তবে ত করিব আমি কবরী বন্ধন।।''[২]

নাটকের শুরু থেকেই ভীমসেনকে কৌরবদের বিরুদ্ধে মারমুখী ভূমিকায় দেখা যায়। কিন্তু মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ যখন দৌত্য কর্মে নিযুক্ত তখন অন্যান্য ভাইদের মতো ভীমসেন সকলকে বিস্মিত করে জনার্দনকে বললেন -

> ''হে মধুসূদন! তুমি কুরুসভায় গমন করিয়া যাহাতে আমাদের উভয় পক্ষের শান্তিলাভ হয়, এরূপ কথা কহিবে; যুদ্ধের কথা উত্থাপন করিয়া কদাচ কৌরবগণকে ভীত করিও না; দুর্যোধনের প্রতি কটূক্তি করিও না। সান্ত্ববাদদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিও। . . . তুমি আমাদের পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সভাসদগণকে বলিবে যে, যাহাতে আমাদের পরস্পর সৌভাত্র জন্মে ও দুর্যোধন প্রশান্ত হয়, তাঁহারা এমন কোন উপায় নির্দ্ধারিত করুন।''[৩]

সকলেই জ্ঞাতিনাশক মহাযুদ্ধকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন কেবল সর্বকনিষ্ঠ সহদেব যুদ্ধের অনিবার্যতায় দৃঢ়সংকল্প থেকেছেন। তিনি বললেন -

> ''হে অরাতিনিপাতন মধুসূদন! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতে সন্ধি করা কর্তব্য, ইহা স্থির হইলেও, যাহাতে যুদ্ধ হয়, আপনি তদ্রূপ কার্য্য করিবেন। যদ্যপি কৌরবগণ আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে মত প্রকাশ করে, তাহা হইলেও আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধসংঘটন করিবেন। যখন সভামধ্যে পাঞ্চালীর তাদৃশ অপমান সন্দর্শন করিয়াছি, তখন দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্রোধসংবরণ করিব?''[৪]

নাট্যকাহিনির উৎস বিচারে মহাভারতে দ্রৌপদীর সংলাপ :

''হে জনার্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে।''[৫]

''আজি আবার ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।''[৬]

নাটকে ভীমসেন সন্ধি বিষয়ে কোনো নমনীয়তা প্রদর্শন করেননি বরং সহদেবকে রাজাজ্ঞানুযায়ী বিনম্র হতে দেখা যায়। দ্রৌপদীর একমাত্র ভরসা ভীমসেনকে এই নাটকে নায়ক করে দেখানো হয়েছে। সভাপর্বে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ছাড়াও ভীমের ব্যক্তিগত ক্ষোভ নাটকে উপেক্ষিত হয়নি।

'দুর্যোধন বাল্যকালাবধি আমারই শত্রুতা করেছে, রাজার সঙ্গেও করে নাই, কৃষ্ণের সঙ্গেও করে নাই, তোমাদের সঙ্গেও করে নাই, তোমরা সন্ধি করবে না কেন?' (১ম অঙ্ক)

সন্ধির শর্তানুযায়ী পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করার কথা রামনারায়ণের নাটকে উল্লেখ মাত্র রয়েছে কিন্তু ভট্টনারায়ণ নির্বাচিত পাঁচটি গ্রামের নেপথ্যে অন্য ব্যাখ্যা দেন। তাঁর নাটকের সংলাপ -

সহদেব : ইন্দ্রপ্রস্থ, বৃকপ্রস্থ, জয়ন্ত, বারণাবত এই চারটি, আর যে কোন একটি গ্রাম।

ভীমসেন : তাতে কি হলো?

সহদেব : তাতে মনে হয় চারটি গ্রামের নাম উল্লেখ করে এবং পঞ্চমটির নাম উল্লেখ না করে বিষান্ন ভোজন, জতুগৃহ, দ্যূতসভা প্রভৃতি অপকারের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। (১ম অঙ্ক)

সংস্কৃত ও বাংলা নাটকে দাসীর বক্তব্য প্রায় অভিন্ন হলেও প্রকাশ ভঙ্গিতে পার্থক্য লক্ষণীয় -

চেটী : তিনি (ভানুমতী) বললেন, অয়ি যাজ্ঞসেনি! শুনেছি পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করা হয়েছে তবে কেন এখনও চুল বাঁধা হয় নি?

চেটী : অয়ি ভানুমতি! তোমাদের কেশ বাধাঁ থাকতে আমাদের দেবী কেশ বাঁধবেন কি করে? (ভট্টনারায়ণ)

চেটী : বললে, অলো দ্রৌপদী শুনচি তোর ভাতারেরা পাঁচখানি গ্রাম চাচ্চে তবে তোর চুল এখনো খোলা কেন?

চেটী : আমি বললেম আগে তোমাদের চুল খোলা হোক তারপর দেবী চুল বাঁধবেন। (রামনারায়ণ)

মূল মহাভারতে দুর্যোধন মহিষী রূপে ভানুমতীর নাম উল্লেখ নেই। সংস্কৃত নাট্যকার ভট্ট নারায়ণই তাঁর 'বেণীসংহারম্' নাটকে প্রথম এই নামটি ব্যবহার করেন এবং পরবর্তী কলে

অন্যান্য কবি সাহিত্যিকগণ দুর্যোধনের স্ত্রী হিসেবে ভানুমতীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মধুসূদনও তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে ভট্টনারায়ণের কল্পিত নামটিকে গুরুত্ব দিয়ে পত্রকাব্য রচনা করেছেন। মহাভারতে মাত্র দুটি জায়গায় দুর্যোধনের স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমবার স্ত্রীপর্বে গান্ধারীর বিলাপে আর দ্বিতীয়বার শান্তিপর্বে -

> ''দীর্ঘকেশী, বিপুলনিতম্বা, স্বর্ণবেদীসদৃশ লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে। . . . লক্ষ্মণমাতা রুধিরাক্তকলেবর স্বীয় পুত্রের মস্তকঘ্রাণ ও দুর্যোধনের দেহ পরিমার্জন করিতেছে এবং কখন পতির ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে অধীর হইতেছে।''[৭]

কলিঙ্গদেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ংবর সভা থেকে দুর্যোধনের রাক্ষস বিবাহের বর্ণনা -

> ''সমস্ত ভূপতি স্বয়ংবরসভায় উপবিষ্ট হইলে রাজকন্যা ধাত্রী ও বর্ষবরগণ সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধাত্রীমুখে ভুপালগণের নাম শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে দুর্যোধনকেও অতিক্রম করিলেন। তখন বলমদমত্ত ভূপতি দুর্যোধন উহা সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া অন্যান্য ভূপালগণের প্রতি অসম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীর্য্যসাহায্যে সেই কন্যাকে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।''[৮]

কাশীরাম দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভা প্রসঙ্গে ভানুমতীর স্বয়ংবরও বর্ণনা করেছেন। এখানে ভানুমতী প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের কন্যা। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ভানুমতীর রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাশীরাম বলেছেন -

> ''ভানুর প্রকাশে যেন তিমির বিনাশ।
> ভানুমতী রূপে তথা করিল প্রকাশ।।
> দেখিয়া মোহিত হৈল যত রাজগণ।
> ষোড়শ কলাতে যথা চন্দ্রের শোভন।।''[৯]

দ্বিতীয় অঙ্কে ভানুমতীর দুঃস্বপ্নের বিবরণে নকুল কর্তৃক শত সর্প ধ্বংস ও নকুলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মধ্যে সংস্কৃত নাটকের শৃঙ্গার রসের ইঙ্গিত- 'ততস্তেনসপ্রগল্‌ভ প্রসারিতকরেণপহৃতং মে স্তনাংশুকম্', রামনারায়ণ এড়িয়ে গেছেন। আবার ঝড়ের মধ্যেও ভানুমতীর সৌন্দর্য বর্ণনার সুযোগ সংস্কৃত নাট্যকারেরা ছাড়েন না–

> ''ক্ষুদ্র ধূলিকণা ঐ আয়ত নেত্রের কষ্টের কারণ হয়েছে, পীনস্তন ভারাক্রান্ত বক্ষস্থলের মৃদু কম্পনে কণ্ঠহার আন্দোলিত হচ্ছে, ধীরগমনে ও স্থূল জঘন ভারে ঊরুদ্বয় কাঁপছে।'' (২য় অঙ্ক, ভট্টনারায়ণ)

ভট্টনারায়ণের নাটকে দুর্যোধন স্পষ্ট ভাবেই শতসর্পের সঙ্গে শতভ্রাতার সাদৃশ্য অনুভব করে শঙ্কিত হয়েছেন, 'শতসংখ্যাপুনরিয়ং সানুজং স্পৃশতীব মাম্'। দুর্যোধনের আত্মনাশের বিমূঢ় উচ্চারণ –

> ''সহভৃত্যগণং সবান্ধবং সহমিত্রং সসুতং সহানুজম্।
> স্ববলেন নিহন্তি সংযুগে ন চিরাৎ পাণ্ডুসুতঃ সুযোধনম্।।'' (২য় অঙ্ক, ভট্টনারায়ণ)

একই রকম রামনারায়ণের দুর্যোধনও 'যা হউক পাণ্ডবেরা বন্ধুবান্ধব পুত্রমিত্রাদির সহিত দুর্যোধনকে শীঘ্রই সংহার করবে।' (২য় অঙ্ক) মহাভারতের আত্মগর্বী দুর্যোধনের পক্ষে নিজের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য কল্পনাতীত। দুর্যোধনকে বোকা সাজিয়ে রসিকতা করবার লোভ কোনো নাট্যকারই সামলাতে পারেননি। ভানুমতীর দুঃস্বপ্ন মধুসূদনের পত্রকাব্যকেও প্রভাবিত করেছে। তবে পত্রকাব্যে কোনো রূপকের আড়ালে নয়, কুরুযোদ্ধাদের মৃত্যু দৃশ্য তাকে শঙ্কিত করেছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নাটকের নেপথ্যে অভিমন্যু বধের প্রতিক্রিয়ায় অর্জুনের জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা ও অকৃতকার্য হলে আত্মনাশের সঙ্কল্প–'অসমাপ্তপ্রতিজ্ঞাভারস্যাত্ম বধোহস্য প্রতিজ্ঞাতঃ' জয়দ্রথের মাতার দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। কাশীরামে মৃত্যুভয়ে কম্পিত জয়দ্রথ স্বয়ং দুর্যোধনের নিকট উপস্থিত হয়েছেন–

''শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ।।
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয়।।
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে।
আপনি মরিবে সেই পুড়ি বৈশ্বানরে।।''[১০]

সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নারী ও নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রের বেলায় প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করেছেন ভট্টনারায়ণ। তৃতীয় অঙ্কে রাক্ষসী বসাগন্ধা দ্রোণের রক্তপানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাক্ষস রুধিরপ্রিয় বলল, 'ব্রাহ্মণ সোনিঅং ক্খু পদং গলঅং দহংতে প্পবিসদি,তা কিং এদিনা–বসগন্ধে!' ও ব্রহ্মরক্ত, গলদেশ দগ্ধ করে নীচে নামবে, ওতে দরকার নেই।

উভয় নাটকেই অশ্বত্থামাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের দুটি গর্ভাঙ্কে পিতা দ্রোণাচার্যকে বধের প্রতিক্রিয়ায় অশ্বত্থামা ক্রোধাগ্নি উদ্‌গিরণ করেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছেন। 'হে যুধিষ্ঠির তুমি না সত্যবাদী ধর্মপুত্র? তুমি আমার পিতার নিকটে মিথ্যে কথা কইলে? আঁ–যা বেটা তুই মিথ্যাবাদী ভণ্ড।'(৩/১)

অশ্বত্থামা ও কর্ণের মধ্যে বিতর্ক দৃশ্য মহাভারতে নেই, তৃতীয় অঙ্কের এই অংশটি নাট্যকারের কল্পনা। দ্রোণাচার্যের অস্ত্রত্যাগের যে কারণ নাট্যকার দেখিয়েছেন সে ব্যাখ্যা অমহাভারতীয় কিন্তু নাটকের পক্ষে অসম্ভব নয়। ভট্টনারায়ণের কর্ণ যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন রামনারায়ণ তাই অনুসরণ করেছেন। কর্ণ দুর্যোধনকে জানালেন -

> 'দ্রোণাচার্যের অভিপ্রায় ছিল যুদ্ধে ক্রমে উভয় পক্ষ ক্ষয় করে পরিশেষে অশ্বত্থামাকেই রাজা করবেন, তা অশ্বত্থামা মরেছে শুনে ভাবলেন আর কেন, মানস তো পূর্ণ হল না—তবে আমি ব্রাহ্মণ আর অস্ত্রধারণের প্রয়োজন কি, তাই অস্ত্রত্যাগ করলেন।'(৩/২)

পরশুরাম পিতার অপমানে যা করেছিলেন অশ্বত্থামাও তাই করবেন বলে রামনারায়ণের নাটকে উল্লেখ থাকলেও সংস্কৃত নাটকে তা ধারালো সংলাপে উচ্চারিত হয়েছে, 'ওহে পরশুরাম শিষ্য কর্ণ, আরও শোন, যে স্থানে শত্রুর রক্তে পাঁচটি হ্রদ তৈরী হয়েছিল এটা সেই দেশ, ক্ষত্রিয়ই আজ আবার পিতার কেশধারণে অপমান করেছে।'(তৃতীয় অঙ্ক) মহাভারতের বনপর্বে পরশুরামের পিতৃহত্যার প্রতিশোধের কাহিনি রয়েছে। আশ্রমে পরশুরামের অনুপস্থিতির সুযোগে কার্তবীর্যার্জুনের পুত্ররা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয় পরশুরামের পিতা জমদগ্নিকে হত্যা করে। পরশুরাম পিতাকে নিহত দেখে পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করার প্রতিজ্ঞা করেন। কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি হ্রদ ক্ষত্রিয়রক্তে পূর্ণ করে ঐ রক্তে পরশুরাম পিতৃপুরুষের তর্পণ করেছিলেন।

কৃপাচার্যের প্রস্তাবে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিসিক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে কর্ণের বিদ্রূপহাস্য ও কর্ণকে অর্ধরথী বলে উল্লেখ সংস্কৃত নাটকে নেই। ভট্টনারায়ণের নাটকে কর্ণকে একাধিকবার 'রাধাগর্ভভারভুত', 'সুতাপশদ' বলে আহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। রামনারায়ণের অশ্বত্থামার কর্ণের মস্তকে পদাঘাত করার দুঃসাহসিক স্পর্ধা কেবল অমহাভারতীয়ই নয়, স্থূল অবাস্তব। অথচ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তান বলেই কর্ণ তাকে বধ করা থেকে বিরত হন। ভট্ট নারায়ণ নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই ব্রাহ্মণের প্রতি পক্ষপাত করেছেন। সংস্কৃত নাট্যসমালোচক জগদীশচন্দ্র তর্কতার্থ এ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, ''সকল জাতির শরীরেই রক্ত থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ রক্তের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্ভব।''[১১] অশ্বত্থামা পৈতে ছিড়ে কর্ণকে চ্যালেঞ্জ জানান। তবে পৃথিবীকে কর্ণার্জুন শূণ্য করার সংলাপ বাংলা নাটকে বর্জিত হয়েছে–

'হন্তা কিরীটিনমহং নৃপ মুঞ্চ কুর্যাং
ক্রোধাদকর্ণমপৃথাত্মজমদ্য লোকম্।' (৩য় অঙ্ক)

দুর্যোধন ও কৃপাচার্যের মধ্যস্থতায় অশ্বত্থামা শেষ পর্যন্ত অস্ত্রত্যাগ করে প্রতিজ্ঞা করেন যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর অস্ত্র ধারণ করবেন না। বস্তুত এই সব কাল্পনিক

দৃশ্যায়ণ মহাভারতে নেই। পিতামহ ভীষ্মের প্রতি ক্রোধে কর্ণ অস্ত্রত্যাগের যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন নাটকে তারই ছায়াপাত ঘটেছে মাত্র। তবে নাটকে কর্ণের শ্লেষাত্মক সংলাপটি অত্যন্ত তির্যক– 'কুলক্রমাগতমেবৈত্দভবাদৃশাং যদস্ত্রপরিত্যাগো নাম।' (আপনাদের অস্ত্রত্যাগ কৌলিক নিয়ম) রামনারায়ণের নাটকে কর্ণের ব্যঙ্গ, 'তোদের অস্ত্র ধরা আর ফেলা তুল্য কথা।'(৩/২)

চতুর্থ অঙ্কের দুঃশাসন বধের দৃশ্য সংস্কৃত নাটকে নেই। আবার দুঃশাসনকে নৃশংস ভাবে হত্যার সমালোচনা বাংলা নাটকে নেই।

> ''ত্রূরং দুশাসনেহস্মিন হরিণ ইবকৃতং ভীমসেনন কর্ম।
> দুঃসাধ্যামপ্যরীণাং লঘুমিব সমরে পূরয়িত্বা প্রতিজ্ঞাং।'' (ভট্টনারায়ণ)
> (ভীমসেন শত্রুর দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা অতি সহজে পূর্ণ করে দুঃশাসনের প্রতি এমন কদর্য আচরণ করল, যা পশুর প্রতিই করা যায়।)

প্রথম অঙ্কের পর এই অঙ্কে ভীমসেনকে দেখা গেল। পূর্ববর্তী অঙ্কের বিস্তৃত পরিসর জুড়ে অশ্বত্থামার আস্ফালন নাটকের লক্ষ্যকে কিছুটা দ্বিধান্বিত করলেও তার কৌরব সেনাপতি হওয়ার তীব্র বাসনা নাটকে অনন্য মাত্রা সংযোজন করে। অশ্বত্থামার মনস্তত্ত্বকে আরোও নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন সাম্প্রতিক কালের অন্যতম নাট্যকার মনোজ মিত্র তাঁর 'অশ্বত্থামা' নাটকে। রামনারায়ণের অশ্বত্থামার আচরণ কখনো কখনো হাস্যকর, সেখানে বিংশ শতকের অশ্বত্থামা অনেক বেশি পরিণত। মহাকাব্যিক চরিত্রগুলি কালেকালে বিভিন্ন নাট্যকারদের হাতে এভাবেই বিবর্তিত হতে হতে পূর্ণতা পায়।

চতুর্থ অঙ্কে সুন্দরকের বর্ণনায় কর্ণপুত্র বৃষসেনের যুদ্ধ সংস্কৃত নাটকের প্রায় অনুরূপই রামনারায়ণের নাটকে রয়েছে। কর্ণের যুদ্ধ থামিয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পুত্রের যুদ্ধ অবলোকনের উল্লেখ নাটকে নেই। আবার মহাভারতের তথ্যানুযায়ী বৃষসেন মাদ্রীপুত্র নকুলকে যুদ্ধে পরাস্ত

করেছেন কিন্তু উভয় নাটকেই অর্জুনের সঙ্গে তার যুদ্ধটাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। কর্ণের সম্মুখেই তার পুত্রকে বধ করার পূর্বে অর্জুনের যে হুঙ্কার তা মহাভারতেই স্পষ্ট রূপে রয়েছে। মহাভারতে এমন অনেক প্রত্যক্ষ ভাষণ রয়েছে যে নাট্যকারদের আলাদা করে সংলাপ সৃজনের দরকার পড়েনি।

> ''আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথমধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদের সমক্ষেই বৃষসেনকে বিনাশ করিব, তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রক্ষা কর।''[১২]

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে কর্ণের চিঠি প্ররেণ নাট্যকারের সংযোজন মাত্র, বলাই বাহুল্য সে অবকাশ মহাকাব্যের কবির নেই। কর্ণকে মঞ্চের নেপথ্যে রেখে তার আবেগকে তুলে ধরার জন্যই নাট্যকার পত্রের অবতারণা করেছেন এবং রামনারায়ণও, 'স্বস্তি মহারাজদুর্যোধনং সমরাঙ্গনাৎ কর্ণ এতদন্তং কণ্ঠে গাঢ়মালিঙ্গ্য বিজ্ঞাপয়তি' –এই চিঠিকে উপেক্ষা করতে পারেননি।

সমরাঙ্গনে আহত দুর্যোধনের নিকট ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, সঞ্জয়ের আগমনের পূর্বে সংস্কৃত নাটকে চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তি ঘটেছে। পুত্র দুর্যোধনের বিপন্ন অবস্থার কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুল হয়েছেন, গান্ধারী বিলাপ করেছেন কিন্তু তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসেননি। ভাসের 'ঊরুভঙ্গম্'-এ তারা দুর্যোনের কাছে এসেছিলেন কিন্তু তা ঊরুভঙ্গের পর। এই নাটকে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য বারবার অনুরোধ করছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে দুর্যোধন এমন এক ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন যে তিনি মৃত্যু ভয়কে অতিক্রম করতে পেরেছেন, 'যুধিষ্ঠির একটি ভাই মলেই প্রাণত্যাগ করবে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর আমার একশ ভাই মরেছে, আমি বাঁচতে চেষ্টা করব?'(৪র্থ অঙ্ক) একই সংলাপ ভট্ট নারায়ণের নাটকে আরও বেশি ক্ষুরধার–

''একটি অনুজের বিনাশে যুধিষ্ঠির আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর দুর্যোধন শত ভ্রাতার মৃত্যুর পরেও কি জীবিত থাকতে পারে? দুঃশাসনের শোণিত পান করেছে ভীম, সেই শত্রুকে গদাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেব না, দীনভাবে সন্ধি করব?''(৫ম অঙ্ক)

মূলত বীররস প্রধান নাটক হলেও ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সমরাঙ্গনে এনে নাট্যকার বাৎসল্যরসকে নাটকে অঙ্গীভূত করার সুযোগ নিয়েছেন। রামনারায়ণের নাটকের এই অংশে পিতা-মাতা-পুত্রের মানসিকতা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে–

দুর্যোধন : আমাকে অনুমতি করুন আমি যুদ্ধে যাই, কর্ণের শত্রু অর্জুনকে আর দুঃশাসনের শত্রু ভীমকে সংহার করে আসি।

ধৃতরাষ্ট্র : এমনি ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু সেই দুর্দান্ত ভীমকে মনে হলে তোমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে ইচ্ছা হয় না।

গান্ধারী : যে আমার একশ সন্তান খেয়েছে সেই সর্বনেশে ভীমের সঙ্গে আবার তুমি যুদ্ধ করতে যাবে? কখনো যেয়ো না।

দুর্যোধন : না মা বারণ করবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র : তা যদি নিতান্তই যুদ্ধে যাও কাকেও সেনাপতি করলে হয় না?

দুর্যোধন : করা গেছে?

ধৃতরাষ্ট্র : কাকে সেনাপতি করলে শল্যকে না অশ্বত্থামাকে?

দুর্যোধন : আর শল্যতেও প্রয়োজন নাই, অশ্বত্থামাতেও প্রয়োজন নাই। আমি চক্ষুর্জলে এবার আত্মাকেই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেছি, এ সেনাপতি হয় ভীমার্জুনকে বিনাশ করবে না হয় আত্মাকে বিসর্জন দিবে। (৫ম অঙ্ক)

একটু পরেই অশ্বত্থামা যখন সেনাপতি হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবেন তখন দুর্যোধন তাকে ফিরিয়ে দেবেন। নাটকের প্রারম্ভে দুর্যোধনকে বোকাবোকা মনে হলেও কুরুক্ষেত্রের চরম বাস্তবতায় তিনি এক যোদ্ধায় পরিণত হয়েছেন।

রামনারায়ণ তাঁর নাটকে ভীমার্জুনকে পুত্রশোকে কাতর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে এনে তার ক্ষত যন্ত্রণাকে বৃদ্ধি করেছেন। মহাভারতে যুদ্ধান্তে লৌহভীম ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে চূর্ণীকৃত হওয়ার পর ভীম ভয়ে ভয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যেতে পেরেছিলেন। নাটকে অবলীলাক্রমে ব্যঙ্গ করার স্পর্ধা প্রকাশ করেছেন।

সংস্কৃত নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক রামনারায়ণের নাটকে পঞ্চম অঙ্কের কায়া ধারণ করেছে। দুর্যোধনের সংবাদ নেবার জন্য গুপ্তচর পাঞ্চালকের নিয়োগ অমহাভারতীয়। মহাভারতে আছে যুদ্ধের পর গভীর নৈরাশ্য ও অবসাদের মধ্যে দুর্যোধন দ্বৈতহ্রদে বিশ্রাম করছিলেন তখন কয়েকজন ব্যাধ তার সন্ধান পায় এবং অর্থের লোভে ভীমকে সেই সংবাদ জানায়। চার্বাক ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সংলাপের দৃশ্যটিও মহাভারতীয় নয়, নাটকের প্রয়োজনে এই দৃশ্যটি কল্পনা করতে হয়েছে। দ্বৈতহ্রদ থেকে দুর্যোধনকে নিস্ক্রমণের প্রচেষ্টায় শ্লাঘাজনক বহু কথা বলবার পর যুধিষ্ঠির তাকে পঞ্চভ্রাতার যেকোনো একজনের সঙ্গে গদা যুদ্ধের আহবান জানান, জয়ী হলে তাকে রাজ্যপাট ফিরিয়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাত হন।

> ‘‘এত শুনি পুনরায় বলে যুধিষ্ঠির।
> উঠিয়া করহ রণ দুর্যোধন বীর।।
> গদা লয়ে রাজা তুমি করহ সমর।
> যে বীর সহিত রণ বুঝি পণ কর।।
> তারে যদি পরাজিবে পুনঃ রাজ্য পাবে।’’[১৩]

নাটকে যুধিষ্ঠিরের কথিত সংলাপটি ভীমের দ্বারা উচ্চারিত হয়েছে এবং এই শর্ত উত্থাপনের ফলে যে ভয়াবহ পরিণাম হতে পারত সে দায়ও ভীমের উপর বর্তায়। ভীম বলেছেন, ‘পাঁচ ভাই যার সঙ্গে পেরে ওঠ যুদ্ধ করো, নকুল সহদেবের সঙ্গেও কি পারবে না এমন শক্তিও কি নাই?’(৫ম অঙ্ক) নকুল সহদেবের তুলনা সংস্কৃত নাটকার দেননি, ‘পঞ্চানামপ্যস্মাকং মধ্যে যেন তে রোচতে তেন সহ সংগ্রামো ভবুত’(৬ষ্ঠ অঙ্ক)। জলস্তম্ভ থেকে দুর্যোধনের আত্মপ্রকাশ সংস্কৃত নাটকে বেশি আকর্ষণীয় ভাবে বর্ণিত হয়েছে–

''ত্যক্ত্বোত্থিতঃ সরভসং সলিলং সলীলৎ
মুদ্‌ভুতকোপদহনোগ্নবিষঃ স্ফুলিঙ্গঃ।
আয়স্তভীমভুজমন্দ্রবেল্লনাভিঃ
ক্ষীরোদধেঃ সুমথনাদিব কালকূটঃ।।'' (৬ষ্ঠ অঙ্ক)

(তখন সে মন্দর পর্বতের মতো বাহু দিয়ে সরোবরের জলরাশি আলোড়ন করে উগ্র ক্রোধবহ্নির বিষময় স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে সরোবরের তলা থেকে উঠে এল, মনে হলো যেন মন্দর পর্বতের মন্থনে দুগ্ধ সমুদ্র থেকে কালকূট বিষ উঠল।)

নাটকে মুনিবেশধারী চার্বাক রাক্ষসের অনুপ্রবেশ নাট্যকারের মৌলিক ভাবনার প্রকাশ। মহাভারতীয় পরিণামকে প্রায় ঘুরিয়ে দিচ্ছিল চার্বাক রাক্ষসের উপস্থিতি। নাটকের অন্তিমে ক্রাইসিস তৈরি করে অনিশ্চিত পরিণামের সম্ভাবনা দর্শকচিত্তে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। দুর্যোধনের সঙ্গে গদাযুদ্ধে ভীমার্জুনের পরাজয়ের মিথ্যে সংবাদে চার্বাকের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী চিতানলে আত্মাহুতি দিতে যাওয়ার ট্র্যাজিক সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত বিফল হয়।

রামনারয়ণের নাটকে বলরাম নিজে হাতেই ভীমসেনকে হত্যা করেছেন বলে চার্বাকের দ্বারা উচ্চরিত হয়। অর্জুন সম্পর্কেও অন্য তথ্য, 'দুর্যোধনের গদা প্রহারে অর্জুনও একেবারে অচৈতন্য হয়ে পরলেন, তা দেখে কৃষ্ণ অর্জুনের শরীর রথে তুলে দ্বারকাভিমুখে চললেন'(৫ম অঙ্ক)। মুনিবেশধারী চার্বাক রাক্ষসের দুটি বর্ণনা মিথ্যে হলেও যুদ্ধে বলরামের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ পৌরাণিক ধারণার ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করে। বলরামের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরের সন্ধিগ্ধ প্রশ্নের জবাবে চার্বাক যে প্রত্যুত্তর করেছেন তা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। চার্বাক বললেন, 'হাঁ মহারাজ, তিনি ভিন্ন অন্যের কি সাধ্য যে ভীমকে বিনাশ করে।' পরপর দুঃসংবাদ শ্রবণে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের বারংবার মূর্ছা রামনারায়ণের নাটকে সীমিত হওয়ায় নাটকের গতি অব্যাহত থেকেছে।

ভীমার্জুনের শোকে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর চিতারোহণের মুহূর্তে রক্তস্নাত ভীমের আকস্মিক আবির্ভাব ও ভীমকে দুর্যোধন ভ্রমের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য যে ভয়ার্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, পরক্ষণেই সেই ভ্রান্তির অবসান নাটককে মিলনাত্মক কমিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। ভীম দ্রৌপদীকে বেণীবন্ধন করতে বললে দ্রৌপদী রোমান্টিক নায়িকার সলজ্জ কণ্ঠে বলেছেন, 'অনেকদিন বাঁধিনি ভুলে গিছি তুমি বেঁধে দাও।' রামনারায়ণের নাটকে ধ্রুপদকন্যা বিদগ্ধা যাজ্ঞসেনীর এই কণ্ঠস্বর অভূতপূর্ব। ভীম দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন করার পর সংস্কৃত নাটকে উচ্চারিত নেপথ্য বাণী, প্রজা নিধন বন্ধ ও রাজকুলের মঙ্গল কামনায় স্বস্তিবচন, 'প্রজানাং বিরমতু নিধনং স্বস্তিরাজ্ঞাং কুলেভ্যঃ'-নাটকে নেই। কৃষ্ণার্জুনের আবির্ভাবে সকলের উপস্থিতিতে নাটকের সুখসমাপ্তি ঘটে কৃষ্ণ ভক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক (১৮৬০) :

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনি মহাভারতের চেয়ে বেশি প্রাচীন এবং প্রায় সবগুলি মুখ্য পুরাণেই তাদের প্রণয়কাহিনি পাওয়া গেলেও কালিদাস মহাকাব্যকেই অনুসরণ করেছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বের আখ্যানকে তিনি যে অসামান্য নাট্যসৌকর্য দান করেছেন তা সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। কবি গেটে শকুন্তলার জার্মান অনুবাদ পড়ে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও তা অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেছেন। কালিদাসের এই নাটকটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সাহিত্য সমালোচকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। ১৮৬০ সালে রামনারায়ণের নাট্যরূপান্তরের পূর্বে ১৮৫৪-এ নাটকটিকে গদ্যাঙ্গিকে অনুবাদ করতে গিয়ে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনেহয়েছে, 'আমি কলিদাসের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি।'[১৪] রামনারায়ণও মহাকবির নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে অসংকুচিত ছিলেননা। বাংলা নাটকের সূচনাপর্বে সংস্কৃত বা ইংরেজিনাটকের অনুবাদ প্রবণতা সমকালীন নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধির পরিপূক ভূমিকা পালন করেছিল। সামাজিক নাট্যান্দোলনের পাশাপাশি বাঙালির মগ্ন চৈতন্যে পুরাণের প্রতি যে শ্রদ্ধা-ভক্তি-দুর্বলতা কাজ

করেছে তারই চরম প্রকাশ ঘটেছিল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। মহাকাব্য কেন্দ্রিক নাটকগুলি এই ধারাকে পুষ্ট করেছিল। নাটকের ভূমিকায় রামনারায়ণ জানিয়েছেন -

> ''সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদাসের কবিত্বসৌরভের কল্পদ্রুমতুল্য যে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক তাহা আমি অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক রসভাবাদি পরিবর্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত করিয়াছি, এতাদৃশ সাহসিক যথেচ্ছাচারিতায় আমি পাঠক মণ্ডলীর রোষ বা পরিতোষের পাত্র হইলাম বলিতে পারি না।''[১৫]

মহাকাব্যের কাহিনি অনুসরণে কালিদাস এবং তা থেকে রামনারায়ণ বাংলা ভাষায় যে নাট্যরূপান্তর করলেন সেখানে মহাভারতের সূত্রানুসন্ধানে উভয় রূপান্তের আলোচনা আবশ্যিক। রামনারায়ণ তাঁর নাটকে মূল নাটকের প্রস্তাবনা ও প্রথম অঙ্কের কিছু অংশ বর্জন করেছেন। নাটক শুরু হয়েছে রাজা ও বৈখানসের কথোপকথন দিয়ে। আবার তৃতীয় অঙ্কও শুরু হয়েছে বিষ্কম্ভক অংশ ও দুষ্মন্তের উক্তি বর্জন করে সরাসরি শকুন্তলার সখীদ্বয়ের প্রবেশের মাধ্যমে। মূল সংস্কৃত নাটকের শ্লোকগুলি অনুবাদের ক্ষেত্রে কবিতায় অনুবাদ না করে নাট্যকার তাদের ভাবার্থ গদ্যে প্রকাশ করেছেন, প্রয়োজন মতো সংক্ষিপ্ত করেছেন। মূল নাটকের কয়েকটি চরিত্র তিনি বর্জন করেছেন। সূত্রধার, ভদ্রসেন, বৈরতক, ঋষিকুমারদ্বয়, বৈতালিকদ্বয়, সোমরাত, দরবারের স্তুতিপাঠক, নাগরিক, শ্লাল, মাতলি এরা রামনারায়ণের নাটকে অনুপস্থিত। কিছু পাত্রপাত্রীর নামও পরিবর্তন করেছেন, মূল নাটকের সারদ্বত, চতুরিকা অনুবাদে হয়েছে সারত্বত ও চূতলতিকা। আবার নতুন চরিত্র রূপে পাওয়া যায় বীরশেখর ও মেধাবিনীকে। সংস্কৃত নাটকের মতো তাঁর নাটকেও অঙ্কসংখ্যা সাত, কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে দুটি করে প্রস্তাব সংযোজিত হয়েছে। দর্শকদের রুচি অনুযায়ী নাটকে ৬টি গান রয়েছে।

রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় এসে তপোবনে মহর্ষি কন্বের অনুপস্থিতিতে তাঁর পালিতা কন্যা শকুন্তলার রূপে আকৃষ্ট হয়ে শর্ত সাপেক্ষে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রকে সিংহাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি তিনি বিস্মৃত হন যা মহাকাব্যিক দৈববাণীতে সমাধান করেছিলেন ব্যাসদেব। মহাভারতের এই কাহিনীকে কালিদাস তাঁর অপূর্ব কল্পনায় নাট্য রূপ দিয়েছেন। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা কবির মানস কন্যা যাঁদের বাদ দিয়ে শকুন্তলাকে কল্পনাই করা যায় না। লোক লজ্জার ভয়ে পত্নীত্যাগের কলঙ্ক দুর্বাসার শাপের দ্বারা আবৃত হয়েছে। শাপের নৈতিকতাও সমগ্র নাটকটিকে এক বিশেষ তাৎপর্যে মন্ডিত করেছে। ষষ্ঠ অঙ্কে দুষ্মন্তের দাহ ও চিত্তশুদ্ধি এবং সপ্তম অঙ্কে ঋষির আশীর্বাদপূত পবিত্র মিলন কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। আংটির প্রসঙ্গ পদ্মপুরাণে উল্লেখ থাকলেও শত প্রক্ষিপ্তবাদে দুষ্ট অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের এই পুরাণের চেয়ে বৌদ্ধ গ্রন্থের কট্হহরি জাতকের কহিনিকে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। জাতকের কাহিনি অনুসারে, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বনে ভ্রমণ করতে করতে একটি সুন্দরী বালিকাকে দেখে মোহিত হলেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। বোধিসত্ত্ব সন্তানরূপে বালিকার গর্ভে এলেন। রাজা বিদায় নেবার সময় তাঁকে একটি আংটি দিয়ে বললেন, মেয়ে হলে আংটি বেচে তাকে মানুষ করবে আর ছেলে হলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। ছেলে জন্মানোর পর একটু বড় হলে মা তাকে রাজার কাছে নিয়ে যান। কিন্তু রাজা ইচ্ছে করেই তাকে না চেনার ভান করেন। অনেক পরীক্ষার পর রাজা তার সন্তানকে স্বীকৃতি দেন ও তাদের গ্রহণ করেন। আংটির ব্যাপারটা কালিদাস এই কট্হহরি জাতক থেকে নিয়ে থাকতে পারেন, তবে সম্পূর্ণ অন্য তাৎপর্যে এই নাটকে ব্যবহার করেছেন।

সংস্কৃত নাটকের নান্দী, নান্দ্যান্তে সূত্রধর ও নটী বাংলা নাটকের স্বভাবধর্মানুযায়ী রামনারায়ণ বর্জন করেছেন। তিনি নাটক আরম্ভ করেছেন তপস্বী বৈখানসের আশীর্বাদ থেকে। তপস্বীর কথায় তপোবনের মৃগশিশু বধ না করার ফলে পুত্র সন্তান লাভের বর পেলেন দুষ্মন্ত। কন্বমুনি আশ্রমে না থাকায় রামনারায়ণের দুষ্মন্ত ইতস্তত বোধ করেছেন, তাই সারথির সমর্থন প্রয়োজন হয়। সখীদের মধ্যে শকুন্তলার কাচুলি শিথিল করে দেওয়ার অংশটি বাঙালি নাট্যকার ইচ্ছে করেই বর্জন করেছেন। প্রচীন সাহিত্যে পীনস্তনী বা চারুনিতম্বিনী সম্মোধন খুব স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চারিত হয় এবং শরীরী বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা কোন রূপ সংকোচ বোধও করেননি।

প্রকৃতির সঙ্গে তপোবনবাসীর আত্মীয়তা বোঝাতে প্রথম অঙ্কের বেশ খানিকটা ব্যয়িত হয়েছে আর সেই সুযোগেই আড়াল থেকে দেখবার অবকাশ পেয়েছেন রাজা দুষ্মন্ত। মহাভারতে তপোবনের বিস্তর বর্ণনা রয়েছে। কাশীরাম পাঁচালিতে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তাতে তপোবনের মাধুর্য ফুটে ওঠে নি যেন গ্রাম্য প্রকৃতির রূপ ব্যক্ত করেছেন –

''নানাজাতি বৃক্ষ তথা ফুলফল ধরে।
নানাজাতি পক্ষী তথা সদা নাদ করে।।
মধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে।
বায়ু-তেজে পুষ্প বৃষ্টি হয় অনুক্ষণে।।''[১৬]

শকুন্তলা ও সখিদ্বয়ের কথোপকথনে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে অবিবাহিতা বলে জানলেও ব্রাহ্মণ কন্যা মনে করে তিনি শঙ্কা বোধ করেন, 'এটি ব্রাহ্মণের কন্যা, ফলতঃ কালফণির শিরোমণিতে কে হস্তার্পণ করতে পারে?'(১ম অঙ্ক) সংস্কৃত রাজার অভিলাষ, 'অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা, যদার্যমস্যাভিলাষি মে মনঃ।' (নিঃসন্দেহে ইনি ক্ষত্রিয়ের পরিনয়-যোগ্য, কারণ আমার পরিশীলিত মন এঁর প্রতি আসক্ত।) আশ্রমে মুনির অনুপস্থিতির কারণ শকুন্তলার প্রতিকূলদৈব প্রশমিত করার জন্য সোমতীর্থ গমন– 'ইদানীমেব দুহিতরং শকুন্তলাম্ অতিথিসৎকারায় নিযুজ্য দৈবমস্যাঃ প্রতিকুলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ।' প্রণয়ের অংশটি দীর্ঘায়িত করতে কন্বমুনির অনুপস্থিতি ও শকুন্তলার দুর্দৈব প্রশমনের ইঙ্গিত নাটকে গুরুত্ব পেয়েছে। মহাভারতে কন্বমুনি আশ্রমের নিকটেই ছিলেন।

''কন্যা বলে গেল পিতা ফলের কারণ
মুহূর্তেক রহ হেথা আসিবে এখন।।''[১৭]

মহাভারতকারের লক্ষ্য পৌরববংশের পূর্বপুরুষ ভরতের জন্মকে তরান্বিত করা, সেখানে দুষ্মন্ত শকুন্তলার ভূমিকা জনক-জননী মাত্র। কিন্তু নাটকের নায়ক-নায়িকার গুরুত্বই বেশি, ভরত নাটকের গৌণ অংশ। মহর্ষি কন্ব অকৃতদার অথচ শকুন্তলা তাঁর কন্যা কি করে হলেন

দুষ্মন্তের এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন অনসূয়া। মহাভারতে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নেই সেখানে শকুন্তলাই অসংকুচিত চিত্তে নিজের জন্ম-ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বামিত্রকে মেনকা ছল করে যেভাবে প্রলুব্ধ করেছিল রতিক্রীড়ায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে এতটুকু লজ্জাবোধ করেন নি মহাকাব্যের নায়িকা।

''অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি।।
. . . . . .
এসকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর।।
মেনকা ধরিয়া মুনি নিল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার বিশেষ।।
. . . . . .
হয়েছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজ দেশে।।''[১৮]

কালিদাস শকুন্তলাকে সলজ্জ স্নিগ্ধভাবে নির্মাণ করেছেন যে প্রথম সাক্ষাৎতেই রাজার সঙ্গে নিজের জন্মবিষয়ক কেচ্ছা শোনাতে প্রস্তুত নন। শকুন্তলা বেশি কথা বলছেন না, তবে দুষ্মন্ত যা বলছেন তা কানপেতে শুনছেন, 'বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ/ কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।' রাজার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় শকুন্তলার পায়ে কুশাঙ্কর বিঁধে যাওয়ার ছল করে দুষ্মন্তকে দেখা বা বল্কল গাছের ডালে আটকে যাওয়ার ছুতোয় পিছিয়ে পড়া ও রাজার অভিব্যক্তির মাঝখানে রামনারায়ণের প্রিয়ংবদার পরিহাস- 'হুঁঃ এখন কত হবে', সংস্কৃত নাটকে নেই।

রামনারায়ণ কালিদাসের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র করেননি। নাট্য সমালোচক সুরেশচন্দ্র মৈত্র মহাশয় 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক' সম্পর্কে বলেছেন, ''রামনারায়ণ কালিদাসের কাহিনীর খোলসটুকু মাত্র নিয়েছেন।''[১৯] কালিদাসের দুষ্মন্ত যখন প্রেমিক রূপে শকুন্তলার কথা ভাবছেন

তখন যে কাব্য ভাব ফুটে ওঠে রামনারায়ণ গদ্য ভাষায় প্রায় একই কথা বলতে চাইলেও সংস্কৃত কবির চেয়ে বাঙালি নাট্যকার বহুদূরবর্তী। আর তফাত যত বেড়েছে রামনারায়ণের স্বকীয়তা সেখানেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বাংলা নাটকের প্রথম যুগের নাট্যকার। ফলে সমসাময়িক নাট্যামোদীদের রুচিবোধ সম্পর্কে তাঁকে সচেতন থাকতে হয়েছে। কালিদাসের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা তাঁর নাটকে যেরূপ স্থূল শরীর ধারণ করেছে তা একটি অংশের তুলনায় অনুধাবন করা যেতে পারে। সংস্কৃত রাজা যখন ভাবছেন–

> ‘এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্বতে।
> স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোহপি নয়নে সৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
> যাতং যচ্চ নিতম্বয়োগুর্রুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।’
> (নিজের মনোভাব অনুসারে প্রিয়জনের মনোভাব কল্পনা করে প্রণয় প্রার্থীরা এভাবেই প্রতারিত হয়। অন্যদিকে দৃষ্টি দিলেও তাঁর সে দৃষ্টিতে ছিল অনুরাগ, নিতম্বভারে তাঁর সে মৃদুমন্দ গমন যেন বিলাসভাব প্রকাশের জন্যই।)

রামনারায়ণের দুষ্মন্ত : ‘শকুন্তলার প্রতি আমার যেরূপ মনোবৃত্তি আমার প্রতি শকুন্তলারও কি সেই রূপ . . . যতক্ষণ আমি নিকটে ছিলেম সাভিলাষ দৃষ্টি আমার প্রতি অনবরত সমর্পণ করেছেন, কিন্তু চারি চক্ষু একত্র হলেই অধোমুখী হয়েছেন, সেই সমস্ত গূঢ়ভাব দর্শন করে অন্তঃকরণ তৎপ্রতি নিরশ্বাসও হচ্ছে না।’ (২য় অঙ্ক)

মহাভারতের রাজার প্রেম বিষয়ে ভাবনার অবকাশ নেই, তিনি রাজকীয় ইচ্ছে প্রকাশ করেন, গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিয়ে করতে চান। এমনকি ফল সংগ্রহ করে কন্বমুনির প্রত্যাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও তিনি রাজি নন। কি অসাধারণ তাঁর বাক্‌চাতুর্য, ‘‘তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্তৃত্ব আছে; অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্মসমর্পণ কর।’’[২০] শকুন্তলাও দুষ্মন্তের প্রলোভনে পা দিলেন, সময় নষ্ট করলেন না–

> ‘‘আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
> সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্য ভার।।

কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ করি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার।।''[২১]

নাটকে ব্যাপারটা অত দ্রুত চাতুর্যপূর্ণ ভাবে ঘটে নি। নায়ক নায়িকাকে প্রেমের অবকাশ দিয়েছেন নাট্যকার। সেই অবকাশে নাটকে অন্যান্য চরিত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের পুরো অংশ জুড়ে রয়েছে বিদূষক চরিত্র। বিদূষক সম্পর্কে সংস্কৃত অলঙ্কারিকদের বিধান মেনেই কালিদাস এই চরিত্রটি নির্মান করেছেন। আশ্রমকন্যা শকুন্তলার উল্লেখে বিদূষকের অভিব্যক্তি, 'খেজুর খেতে খেতে মুখে অরুচি হলে যেমন তেঁতুল খেতে সাধ হয়, শ্রেষ্ঠরমণী সম্ভোগের পর আপনার অভিলাষটিও তেমনি।' রামনারায়ণের বিদূষক শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শোনার যে টিপ্পনীটি কাটেন তা সংস্কৃত নাটকে নেই, 'ইঃ মহারাজ, একেবারে কুলজিশুদ্ধ শুনে এসেছেন।' (২য় অঙ্ক) শকুন্তলা বিবাহিতা কিনা এই আশঙ্কাও রামনারায়ণের বিদূষকের মনে উদয় হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত বনের মধ্যে শকুন্তলার অন্বেষণ করতে করতে আড়াল থেকে তাকে দেখলেন প্রেমানুরাগে কাতরা ও দুই সখিকে তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকতে। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় আছেন আত্মপ্রকাশের জন্য। তার আগে গোপনে জেনে নিচ্ছেন শকুন্তলার মনোভাব। সংস্কৃত নাটকের চেয়ে রামনারায়ণ এই অংশটিকে প্রলম্বিত করেছেন। প্রিয়ংবদা শকুন্তলার শুশ্রূষার জন্য উশীরানুলেপন, অগৌরচন্দন, মৃণাল প্রভৃতি শীতল সামগ্রী আনয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শকুন্তলার মনের কথা জানার জন্য অনুযোগ করেন, 'যে যার আত্মীয় হয় তার নিকটে সে মনের কথা বলে থাকে, তা আমরা তো ওঁর কেউ নই– আমাদের কাচে বলবেন কেন বল?'(৩য় অঙ্ক) দুষ্মন্তের কাছ থেকে যখন বিদায় নেন তখন মালা গেঁথে আনার ছুতো করে সরে পড়েন। সংস্কৃত নাটকে সখিদ্বয় হরিণশাবককে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার ছল করে সরে পড়েন।

সাহিত্যে পত্রের ব্যবহার সুপ্রাচীন কাহিনি গুলিতেও দুর্লভ নয়। রুক্মিনী-দময়ন্তীর প্রেমপত্রের মতো শকুন্তলা প্রাকৃত ভাষায় আবেগঘন যে পত্র রচনা করেন–

''তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি
ণিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুহ বুত্তমণোরহাইং অঙ্গাইং।।''
(হে নিষ্ঠুর, তোমার মনের কথা আমি জানি না, তবে দিনরাত কামদেব
তোমাতে একান্ত অনুগামী আমার অঙ্গগুলোকে অত্যন্ত তাপিত করছেন।)

রামনারায়ণের নাটকে শকুন্তলার চিঠির ভাষ্য ও সেই মুহূর্তেই রাজার আবির্ভাব এবং সহজ তাল মিলিয়ে কথা বলা লঘু কমেডির মতো শোনায়।

শকুন্তলা : না জানি হে তব মন, মোর প্রতি সে কেমন,
যে করে আমার মন, কহিব হে কাহারে।
মদনের ফুলবাণ, সতত তাপিছে প্রাণ,
রাজা : তোমায় তাপিছে মাত্র, দগ্ধ করে আমারে। (৩য় অঙ্ক)

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চলে যাওয়ার পরেই গৌতমীর আগমন প্রেমিক প্রেমিকার ঐকান্তিক মুহূর্তে বাধা প্রদান করে কালিদাস যে পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালি নাট্যকার গৌতমীর আগমনকে বিলম্বিত করে নায়ক-নায়িকার রঙ্গতামাসা দেখানোর লোভ দমন করতে পরেননি। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বাঙালি দর্শকের রুচি বিদ্যাসুন্দরের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি। রাজার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় শকুন্তলার হাত থেকে মৃণাল বলয় খসে পড়া ও সেই বলয়ের জন্যই যেন ফিরে এসে আবার ধরা দেওয়া, চোখে ফুলের রেনু দুষ্মন্তের ফুৎকারে উড়ে যাওয়ার রোমান্টিক দৃশ্য হয়ত তপোবন বিরুদ্ধ ছিল। কালিদাস যা ইঙ্গিতে বলেছেন মহাভারতকার তা বলতে কোনো দ্বিধা করেন না। বিশ্বামিত্র ও মেনকার রমণলীলা বর্ণনা করতেও মহাকব্যের রচয়িতা কার্পণ্যবোধ করেননি।

চতুর্থ অঙ্কে দুর্বাসার শাপ সংযোজনে মহাভারতীয় আখ্যানকে অতিক্রম করে কালিদাস অন্যন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতে শকুন্তলা আখ্যানে শাপ বা দুর্বাসার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই কিন্তু দুর্বসা ব্যতীত কলিদাসের নাটক অকল্পনীয়। নাটকে দুর্বাসাকে চাক্ষুস দেখা যায়নি কিন্তু তাঁর নেপথ্যবাণী অসাধারণভাবে নাট্যোপযোগী হয়ে উঠেছে। শাপের জন্য বিখ্যাত এই মুনির বিশেষ চরিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁকে বহিরাগত মনে করার অবকাশ নেই। মহাভারতে বনপর্বে দুর্যোধন দুর্বাসা মুনির অভিশাপকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। কলিদাস তাঁর নাটকে যে অভিশাপ মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন –

''আ অতিথি পরিভাবিনি!
বিচন্তিয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মার্মুপস্থিতম্!
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।'' (৪র্থ অঙ্ক)

সাহিত্যে অভিশাপকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার নেপথ্যে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয় যে কারণ অনুসন্ধান করেছেন -

> ''মানুষের জীবনে যখন অন্যায় দেখা গেছে, কর্তব্যে অনবধানতা লক্ষ্য করা গেছে, তখনই গ্রীক সাহিত্যের নেমেসিসের মতো সংস্কৃত কবিরা ব্যবহার করেছেন দুর্বাসার শাপকেই।''[২২]

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্য-সাহিত্যে অভিশাপ বা বর এতটাই ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে এসকল শাপ-বর সাহিত্যের একটি অন্যতম উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত আদি কবি বাল্মীকি প্রথম যে শ্লোক বা কাব্য বাণী উচ্চারণ করেছেন তা ও একটি অভিশাপই। নিষাদ তুই কখনোই প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না –

''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।''[২৩]

সমালোচক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দুর্বাসার শাপ সম্পর্কে বলেছেন -

> ''মহাভারতে রাজা দুষ্মন্ত বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি গান্ধর্ব বিধানে শকুন্তলা বিবাহ করিয়া গিয়া সেকথা আর তুলেন নাই। মনে বেশ ছিল, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই, . . . কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপ আনিয়া ঐ মহাপুরুষকে রাজার মতন রাজা, এমন কি দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন।''[২৪]

রামনারায়ণের নাটকে প্রিয়ংবদা দুষ্মন্তের সমালোচনা করেছেন, 'ছি! ছি! ছি! যাদের ঐশ্বর্য থাকে তারা কি একেবারে উন্মত্ত? কোনো বিবেচনাই নাই! ছি! এমন অধার্মিক লোক তো আমি ত্রিসংসারে দেখিনি।' শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠানোর সংবাদ গৌতমী সখিদ্বয়ের কাছে এনেছেন, কালিদাসে গৌতমীর এই ভূমিকাটুকু নেই।

> প্রিয়ংবদা : হাঁ পিসি প্রিয়সখীকে নিতে কি মহারাজ আপনিই এসেছেন?
>
> গৌতমী : না, কেউ আসেনি, মহর্ষি আপনিই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। (৪র্থ অঙ্ক)

শকুন্তলার গর্ভসঞ্চারের কথাও গৌতমীর কাছ থেকে শুনে বিস্মিত হওয়ার উচ্ছ্বাস রামনারায়ণের সংযোজন। প্রিয়ংবদা পরমাহ্লাদে বললেন, 'পিসি, সেকি! প্রিয়সখীর কি গর্ভ হয়েছে! তা কই আমরা এতদিন টের পাইনি?'

> ''পঞ্চম অঙ্কের প্রথমে নাগরিকবৃত্তির মধ্যে যখন দেখিলাম যে, এখানে হৃদয় বড়ো কঠিন, প্রণয় বড়ো কুটিল এবং মিলনের পথ সহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্যস্বপ্ন ভাঙিবার মতো হইল। . . . নাটকের প্রথম চারি অঙ্কে যে সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা এক মুহূর্তেই নিঃশব্দ হইয়া গেল।''[২৫]

শকুন্তলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় আলোচনা নাটকটিকে অনুধাবন করতে সহায়তা করবে। এই অঙ্কের শুরুতে রামনারায়ণ রাজা দুষ্মন্তের স্তুতিতে একটি সঙ্গীত সংযোজন করেছেন। সংস্কৃত নাটকের হংসপদির নেপথ্য সঙ্গীত নাট্যকার যতটা তরলিত করে উপস্থাপন করেছেন সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে সংহত গাম্ভীর্য কালিদাসের অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ : ''নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি?''[২৬]

রামনারায়ণ : 'ভ্রমরা নবমিলনে, ছিলে সেখানে,
রসাল মুকুলে আর, পড়ে না কি মনে।' (৫ম অঙ্ক)

সংস্কৃত নাট্যকার মহাভারতের শকুন্তলাকে যে অবগুণ্ঠনে আদৃত করেছেন বাঙালিনাট্যকার তা উন্মোচন করেন নি। মহাভারতে শকুন্তলা গর্ভবতী অবস্থায় দুষ্মন্তের দরবারে আসেননি, তিনি দুষ্মন্ত আত্মাজ ভরতকে সঙ্গে নিয়েই হাজির হয়েছিলেন। মহাভারতে ভরতই ছিলেন শকুন্তলার তুরুপের তাস।

মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলার পত্র করুণ আর্তিতে পূর্ণ, নিজের ভাগ্যের প্রতি তিনি দোষারোপ করেছেন, প্রেমের পরিণামের প্রতি বিদ্রূপ করেছেন –

''হে বিধাতঃ এই কি রে ছিল তোর মনে?
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে?''[২৭]

দুষ্মন্তের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নেই, অভিমান মিশ্রিত বেদনা রয়েছে। স্বামীর পায়ের তলায় দাসীরূপে স্থানপেতেই তিনি মরিয়া –

''কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি– এই লোভ মনে,
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!
. . . .
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে! ''[২৮]

দুষ্মন্তকে দেখার পর শকুন্তলার মনের ভাবাবেগের মধ্যে স্ত্রীর কৃত্তিম অভিমান রামনারায়ণ স্বগতোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন–

> 'নাথ, তুমি এমন নিষ্ঠুর আমাকে ভুলে রয়েছ, –ভাল আমি এর পরিশোধ দেব, কথা তো কবো না।' তিনি কঞ্চুকীর স্বগতোক্তির মধ্যে বলতে পারেন দর্শকের মনের কথা, 'মহারাজ ধর্মভীরু নতুবা এমন স্ত্রীরত্ন কে পরিত্যাগ করে?' (৫ম অঙ্ক)

আংটির জন্য ধীবরকে ধরে এনে রাজানুচরের জিজ্ঞাসাবাদের প্রত্যুত্তরে জেলে তার জাতকুলের পরিচয় দিতে শুরু করলে বাঙালি নাট্যকার রঙ্গকরে বলেন, 'বেটার যেন বে'। মাছের পেট থেকে প্রাপ্ত অঙ্গুরীর গন্ধ শুকে জেলের কথার সত্যতা সম্পর্কে শ্যালকের ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছে, সেখানে বাংলা নাটকে 'ও মিছেমিছি মাছের গন্ধ করে এনেছে' (ষষ্ঠ অঙ্ক) –এরূপ অতিরঞ্জিত সংলাপ শুনতে পাওয়া যায়। বিশেষত নিম্ন শ্রেণির চরিত্র অঙ্কনে বাঙালি নাট্যকারেরা রঙ্গতামাসা সৃষ্টির সামান্যতম সুযোগ পেলেও হাতছাড়া করেননি। সংস্কৃত নাটকের গুরুগম্ভীর চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও বাঙালির সহজসরল হৃদয়াবেগের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কৌতুহল নিবৃত্তির চেয়ে কৌতুককেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রথম যুগের অধিকাংশ নাট্যকার। অঙ্গুরীর স্মৃতিতে দুষ্মন্তের চোখ জলে ছলছল করলেও সংস্কৃতের গাম্ভীর্যে তা কান্নায় পরিনত হয় না, কিন্তু বাঙালির আবেগকে বিগলিত না করলে যেন দুঃখ প্রশমিত হয়না– 'ক্ষণকাল পরে নয়নে জলধারা পড়তে লাগল।'

মেনকার সখী সানুমতী কে মিশ্রকেশী নামে অভিহিত করেছেন রামনারায়ণ। বসন্তের আবহ সৃষ্টিতে তিনি দুই সখী পরভৃতিকা ও মধুকরিকার কণ্ঠে একটি গান জুড়ে দিয়েছেন –

> 'বসন্ত আইল পুন, কত সুখ হয় রে,
> নবনব কিসলয়, কানন সাজায় রে।'(ষষ্ঠ অঙ্ক)

দুষ্মন্তের নির্দেশে বসন্তোৎসব বন্ধ থাকায় গান থেমে গেল। সংস্কৃত নাটকে গান নেই, আর বাংলা নাটকে সখী আছে গান থাকবে না –এমন প্রায় দেখাই যায় না।

শকুন্তলাব্যাধিতে দুষ্মন্তের মনোবিকার বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাসের কঞ্চুকী সংযম হারাননি। বাংলা নাটকে কঞ্চুকী সেই অবস্থাকে বোঝাতে গিয়ে রামের বিলাপ জুড়ে দিয়েছেন– 'এক একবার তাঁর নয়নগলিত জলধারা মুক্তামালার ন্যায় বক্ষঃস্থলে পতিত হয়–এক একবার তিনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন!'(ষষ্ঠ অঙ্ক)

শকুন্তলার বিরহে কাতর দুষ্মন্তের উৎকণ্ঠার সঙ্গে উত্তরসুরির ভাবনাকেও সংযুক্ত করে দেখেছেন রামনারায়ণ। বিদূষকের কথার প্রেক্ষিতে দুষ্মন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, 'গর্ভবতী কুলপ্রতিষ্ঠা সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করে শশাঙ্ককুল একপ্রকার নির্মূল তো করা হয়েইছে।' শকুন্তলার চিত্রপট অঙ্কনের দৃশ্য দুষ্মন্তের মানস চিত্রকে উন্মোচিত করেছে। নিঃসন্তান ধনমিত্র বা বসুমিত্র নামে ধনী বণিকের মৃত্যুতে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে দুষ্মন্তের প্রজাপ্রতিপালক রাজারূপে দেখানোর চেয়ে তার ব্যক্তিগত সমস্যার পরিপূরক হিসেবে এই উপকাহিনিটি সংযোজিত হয়েছে।

মহাভারতে শকুন্তলা কাহিনিতে ভরতের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাটকেও শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে বংশের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ জুড়ে গেছে। শুধুমাত্র প্রেয়সীর জন্য ব্যাকুলতা নয় বংশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকটি নাটকে সংযোজন করেছেন সংস্কৃত নাট্যকার– 'এ-যেন সময়-মতো বীজ-বোনা প্রচুর-শস্যসম্ভাবনাময় ভূমিকে ত্যাগ করার মতো।' বাঙালির বিদূষক এক্ষেত্রে চুপ করে থাকতে পারেন না, 'বলি আপনি এত ক্ষোভই কেন করেন? রাজমহিষীদের গর্ভে আপনার কি সন্তান হবেই না?' (ষষ্ঠ অঙ্ক)

ইন্দ্রসারথি মাতলি দ্বারা বিদূষকের নিগ্রহ রামনারায়ণ বর্জন করেছেন। কালনেমির পুত্র দুর্জয়কে নিধনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র দুষ্মন্তকে আহবান করেছেন। ইন্দ্রকে সহায়তা করার পুরস্কার স্বরূপ হেমকূট নামে কিন্নর-পর্বতে দুষ্মন্ত ফিরে পান তাঁর পুত্র সর্বদমন ও শকুন্তলাকে।

সর্বদমনকে দুষ্মন্তের পুত্র বলে নিশ্চিত হওয়ার ক্রমোন্মচনে কালিদাস যতটা বৈচিত্র্যের আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে রামনারায়ণ খুব সহজেই গ্রন্থিমোচন করেছেন। সর্বদমনের রক্ষাকবজ স্খালনের ঘটনা রামনারায়ণে নেই, খেলনা স্বরূপ মাটির ময়ূর প্রদানের পরিবর্তে অঙ্গুরীয় দিতে চাওয়ার ইচ্ছা রামনারায়ণের চিন্তা প্রসূত, 'আমার মায়ের একটি আংটি ছিল, জলে পড়ে গে মায়ের বড় বিপদ হয়েছে তা কারু আংটি নিতে নাই মা আমাকে বলেছে।' (৭ম অঙ্ক) দুষ্মন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর বাংলা নাটকে শকুন্তলা বড়ো বেশি কথা বলেছে। সংস্কৃত নাটকে তার সংলাপ খুবই সংহত। প্রগাঢ় অনুভুতি বাকসর্বস্বতায় তরলিত হয়নি। মারীচ মুনির নাম পরিবর্তন করে কশ্যপ করায় বিষয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি। শেষ অঙ্কে দৈব আখ্যান রামনারায়ণ সংক্ষেপিত করেছেন।

রুক্মিণীহরণ নাটক (১৮৭১) :

রামনারায়ণের পুরাণ নির্ভর নাটকগুলির মধ্যে 'রুক্মিণীহরণ নাটক' হরিবংশ বা ভাগবত অনুসারী হলেও মহাভারতের মধ্যে তার বীজ নিহিত রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে রুক্মিণীহরণ প্রক্ষিপ্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, ''মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্মিণী যে হৃতা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না।''[২৯] কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে এবং বর্তমানেও অনেকে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর গবেষণা পদ্ধতির ত্রুটি উল্লেখ করে সমালোচক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন, ''যে উপাখ্যান বা শ্লোক তাঁর কল্পিত আদর্শকৃষ্ণর অগৌরবের কারণ হতে পারে, সেটিকেই তিনি যেন তেন প্রকারণে প্রক্ষিপ্ত বলে বাতিল করে দেন।''[৩০] মহাভারত সমালোচক নৃসিংহ ভাদুড়ী মহাশয় তীব্র ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন, ''বিশেষত বঙ্কিমের কৃষ্ণ যত আদর্শবাদী নেতা কিংবা মহাভারতের বিসমার্ক হন না কেন, তবু তিনিই সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নন।''[৩১] রুক্মিণী হরণ সম্পর্কে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ -

> ''এমন কোনও শাস্ত্রীয় এবং মহাকাব্যিক উপাদান নেই, যেখানে ভীষ্মকআত্মজা রুক্মিণীর বিষয়ে সেই রাক্ষস বিবাহের কথা উল্লিখিত হয়নি এবং এমন কোনও শাস্ত্রীয় উপাদান নেই,

যেখানে রুক্মিণী দ্বারকার পট্টমহিষী বলে স্বীকৃত নন। বিশেষত মহাভারতে রুক্মিণীর বিবাহের কারণে কৃষ্ণের শৌর্য-বিক্রমের ঘটনাটা একটা উদাহরণ হয়ে আছে।''[৩২]

রুক্মিণী হরণের উপর প্রক্ষিপ্তবাদের বঙ্কিমদৃষ্টি অতিক্রম করে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের ভিত্তিতে রুক্মিণী হরণ নাটকের বিশ্লেষণে কাশীরামের আখ্যানে শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দার অংশটি উল্লেখযোগ্য –

''ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
বহু দিন হয় নাহি জানে সর্বজন।।
হরিয়া লইলি তারে রাজসভা হৈতে।
পুনঃ সেই কথা কহ নির্লজ্জ মুখেতে।।''[৩৩]

মহাভারতের সমালোচক আরো নিপুণ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ''শিশুপাল মরার দিন পর্যন্ত সক্রোধ অভিমানে বলেছে–রুক্মিণী আমার ছিল, এই কৃষ্ণ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছে–মৎপূর্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণঃ।''[৩৪]

নাটক রচনার ক্ষেত্রে রামনারায়ণ এই তথ্যটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া মহাভারতের রাজনৈতিক প্রতিবেশে জরাসন্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই প্রতিপক্ষের প্রবল সংঘাত স্বাভাবিক ভাবেই বিপরীতমুখী ঘুর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছে। বিশেষত শিশুপাল জরাসন্ধের পুত্রতুল্য, রুক্মিণীর ভাই রুক্মী জরাসন্ধের বশংবদ, নিরুপায় ভীষ্মক ভয়ার্ত এবং অপরদিকে জরাসন্ধের জামাতা কংসের ঘাতক কৃষ্ণ। ফলে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পারস্পরিক অনুরাগ এবং দ্বারকানাথের রাজনৈতিক ফায়দার অঙ্ক চরম নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অবশ্য নাটকে কৃষ্ণকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়নি। রোমান্টিক নায়কের মতো কৃষ্ণ সবরকম অলৌকিককতা বর্জন করে স্বাভাবিক মানবে পরিণত হয়েছেন।

নাটকে জটিলতা সৃষ্টি করতে নাট্যকার নারদকে নিয়ে এসেছেন। নারদ চরিত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পর্কে নৃসিংহ ভাদুড়ী মহাশয় মধ্যযুগীয় কাব্যকারদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা আধুনিককালের নাট্যকারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

> ''তাঁরা সামান্য প্রয়োজনেই যেখানে-সেখানে নারদকে ব্যবহার করেছেন এবং মানুষের মনের মধ্যে যে কলহের প্রবৃত্তিটুকু থাকে, সেটিকে তাঁরা সার্থকভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন কলহ-বিবাদের সমস্ত ক্ষেত্রে নারদকে অবতীর্ণ করে।''[৩৫]

মহাভারতে নারদীয় কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। যে নারদ স্বর্গের পারিজাত ফুল এনে রুক্মিণীর প্রতি সত্যভামার ঈর্ষার সূত্রপাত ঘটাতে পারেন, যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক সূত্রে জড়িত এবং ব্রহ্মাণ্ড পর্যটনে যার দ্বিতীয় কেউ নেই তিনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই রুক্মিণীহরণ নাটকের অন্যতম চরিত্র হতে পারেন।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রুক্মিণীর বিবাহের পাত্ররূপে কৃষ্ণের কথা নারদ ভীষ্মকের কাছে ব্যক্ত করেছেন। যুবরাজ রুক্মী নারদের প্রসঙ্গ শোনা মাত্র উত্তেজিত হন, তিনি তাকে ভণ্ড বলে উল্লেখ করেন। কৃষ্ণ সম্পর্কে রুক্মীর বিরূপ ধারণা নাটকের শুরু থেকেই বিপরীতমুখী সংঘাতের ইঙ্গিত দিয়েছে। কৃষ্ণ নিন্দায় তাঁর জন্ম সমন্ধে ধিক্কার দিয়ে, নন্দ কি বাসুদেবের ছেলে বলে সংশয় প্রকাশ করেন। কৃষ্ণ চরিত্রের নিদারুণ সমালোচনা করে রুক্মিণীর অযোগ্য পাত্র রূপে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন, 'গোপাল হয়ে কখনো ভূপালের কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারে? কই? তার বংশে কেউ কখন রাজা ছিল?'(১/১) রুক্মী কৃষ্ণ সম্পর্কে যে সকল কথাগুলি বললেন তার মধ্যেও একপ্রকার সত্যতা আছে। ভীষ্মক রুক্মিণীকে লক্ষ্মী ও কৃষ্ণকে নারায়ণ রূপে উল্লেখ করলেও উনিশ শতকের যুক্তিবাদী মানুষের কাছে রুক্মীর বক্তব্যগুলি আবেদন সৃষ্টি করে। মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দার সঙ্গে রুক্মীর কথাগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নাটকে রুক্মী কৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন, 'স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, চুরি কোন্ অপবাদ তার নাই?'(১/১) কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে শিশুপাল কৃষ্ণকে 'গোঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারী' বলেছেন।

কাশীরামেও অনুরূপ-

''স্ত্রীলোক পূতনা মারে, বৃষ মারে গোঠে।
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে।।
শ্রীগোবিন্দ নরীঘাতী পাপী দুরাচার।
হেন জনে কর স্তুতি আরে কুলাঙ্গার।।''[৩৬]

এই নাটকে রামনারায়ণের অন্যতম সংযোজন বিদূষক শ্রেণীর ভোজনপ্রিয় পরিহাসরসিক ধনদাসের সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অনুরূপ চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। অজিতকুমার ঘোষ এই চরিত্রটির প্রশংসা করে বলেছেন, ''সরল, লোভাতুর, তোতলা ব্রাহ্মণ ধনদাসের চরিত্রটি সহজে ভুলিবার নহে।''[৩৭] ভাগবতে রুক্মিণী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে যে ব্রাহ্মণের হাতে প্রেরণ করেন নাটকে তারই স্থূল রূপায়ণ ধনদাস। নাটুকে রামনারায়ণের পরিহাস রসিক মনটি এই চরিত্রটির মধ্যে পাওয়া যায়।

পত্রের প্রসঙ্গে মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্যের রুক্মিণী ও ভাগবতের সঙ্গে নাটকের রুক্মিণীর তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ভাগবতের রুক্মিণীকে মধুসূদনের কাব্যে নানাবর্ণে সমুজ্জ্বল প্রেমভক্তির বিনম্র নায়িকা রূপে দেখা যায়। তিনি আত্মপরিচয় দেন কিন্তু কৃষ্ণের নাম মুখে উচ্চারণ করতে তার বাধে। ভাগবতে পত্রের শেষে রুক্মিণীর কোনো নাম নেই। মধুসূদনের নায়িকার রূপগুণ সম্পর্কে কোনো অহং বোধ নেই –

''কিন্তু নাহি রূপ গুণ; কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা!''[৩৮]

ভাগবতে রুক্মিণী নিজের সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আভিজাত্য সবকিছু উল্লেখ করেই তিনি কৃষ্ণকে পেতে চেয়েছেন। শিশুপালের সঙ্গে তুলনায় কৃষ্ণের প্রতি তিনি যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বীরাঙ্গনার নায়িকা ভয়ে শিশুপালের হাত থেকে রক্ষার জন্য কাতর মিনতি জানিয়েছেন। কৃত্রিম বৃন্দাবন রচনা করে তাকে আত্মরতি চরিতার্থ করতে দেখা যায়, তিনি সখীর গলা ধরে কাঁদেন। কৃষ্ণের জীবন কাহিনি বর্ণনার মধ্যে তার অকৃত্রিম কৃষ্ণানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়

কিন্তু অম্বিকাদেবীর মন্দির থেকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা মধুসূদনের চিঠিতে নেই। ‘হরিবংশে রুক্মিণী ইন্দ্রাণীর পুজো দিতে যাচ্ছেন, অম্বিকার নয়।’[৩৯] ভাগবতে অবশ্য অম্বিকার মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। সমালোচক ভবানীগোপাল সান্যাল মধুসূদনের রুক্মিণী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ‘‘বিবাহ না হইয়াও রুক্মিণী যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত জন্মে জন্মে বিবাহিতা।’’[৪০]

রামনারায়ণের নাটকে রুক্মিণী পত্র প্রেরণের পর তার মনে আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে, ‘যদি শ্রীকৃষ্ণ অশ্রদ্ধা করেন, ঘৃণা করেন?’(১/২) তিনি নিজেকে দাসী ভেবে কৃষ্ণের কাছে মিনতি করেন উদ্ধার করার জন্য। ‘দীননাথ! শুনেছি কেহ মহৎ বিপদগ্রস্ত হলে–আপনার পদাশ্রয়–তাকে না কি রক্ষা–এ দাসী ঘোর বিপাকে . . . শ্রীচরণে শরণাগত হলেম’(২য় অঙ্ক)

গোপাল না শিশুপাল, নন্দঘোষের নন্দন না দমঘোষের পুত্র, পাত্রটি যে কে এই নিয়ে সখীদের মধ্যে বিড়ম্বনায় অন্তপুরের দৃশ্যটি নাটকের উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

লবঙ্গ : ও চিত্রে, তুই কি বললি? কে বর?

চিত্রা : শিশুপাল।

লবঙ্গ : দূর হ, অমন কথা বলিসনে।

চিত্রা : না দিদি, তামসা নয়, সত্যিই বলচি, দমঘোষের নন্দন শিশুপাল।

লবঙ্গ : তোর মুখে আগুন, তুই ভুলে গেছিস, নন্দঘোষের নন্দন পশুপাল হবে? (১/২)

চিত্রার সংবাদে বিচলিত হয়ে রুক্মিণী লবঙ্গলতার কাছে বিপদ থেকে রক্ষার উপায় বের করতে বলেন না হলে বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সরলা রুক্মিণী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চিঠিতে কি লিখবে তাও সখীর কাছে জানতে চেয়েছে, ‘তবে তুমি ভাই বলে দেও আমি না হয় লিখি।’ (১/২) এমন গুরুত্বপূর্ণ চিঠি প্রেরণের ক্ষেত্রেও নাট্যকার রসিকতা করার সুযোগ ছাড়েন না।

লবঙ্গ : ব্রাহ্মণঠাকুর, আপনাকে একবার দ্বারকাপুরীতে যেতে হবে, এই পত্রখানি—

ধনদাস : (আহ্লাদে) আঁ, আঁ-প-পত্র। তা দেও, দেও বাছা। দ্বা-দ্বারকাতে কি শ্রাদ্ধ? বসুদেবের কি কাল হয়েছে? (১/২)

নারদ দ্বারকাপুরীতে আগমন করে মণিরত্নের বাহুল্যে রমণীরত্নের অভাবের তির্যক বাক্যবাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করেন। কৃষ্ণ চরিত্রটি অত্যন্ত সাদাসিদে, তাঁর দূরদর্শী কূটনৈতিক সত্তাকে অতিক্রম করে লাজুক প্রেমিকের অবয়ব দিয়েছেন নাট্যকার। 'তা কি করে বিবাহ করি, লোকে যে আমাকে কালো বলে মেয়ে দেয় না।' (২য় অঙ্ক) ''বাস্তব জীবনের নাট্যকার রামনারায়ণের কলমে পৌরাণিক চরিত্রগুলি অনেকটা লৌকিক রসে জারিত হয়েছে।''[৪১] কৃষ্ণ ও রুক্মিনীর বিবাহের ঘটকালীতে নারদের ভূমিকা অসামান্য। তিনি সত্য-মিথ্যে একাকার করে কথার ফুলঝুরিতে কৃষ্ণের সুকোমল মনটি তাতিয়ে তুলেছেন।

নারদ : যার এত লজ্জা, এত মান ভয়, তার কি কখন বিয়ে হয়? তা থাক
আমি এখন চললেম,–আমাকে একবার বিদর্ভদেশে যেতে হবে।

কৃষ্ণ : এই সর্বনাশ করে, বলি ওসব কথা যেন সেখানে কিছু না বলা হয়। (২য় অঙ্ক)

নাটকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নারদ, ধনদাস এবং কতগুলি অপ্রাধান চরিত্র, মূলত দাসী বা সখীদের উৎকণ্ঠা নাটকীয় ঘটনার চেয়ে বেশি অভিনিবেশ করেছে দর্শক মনোরঞ্জনার্থে। ধনদাসের ভাড়ামো সমকালীন দর্শক রুচির পরিপোষক। তার ভোজন ও নিদ্রা স্থূলহাস্যরসাত্মক। চন্দ্রপুলি ব্রাহ্মণীর মুখমন্ডলে উদয় না হয়ে কেবল রাহুগ্রাসে পরার কৃত্রিম বেদনা, ঘটি ও গামছা হারানোর দুঃখ এবং তাকে আপাত গৃহহীন করে মজা করবার প্রলোভন নাট্যকার দমন করতে পারেননি।

নারদের প্রস্থানের পর বিদর্ভ থেকে ব্রাহ্মণের আগমন কৃষ্ণের মনে আশার সঞ্চার করে। তিনি স্বহস্তে ধনদাসকে তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করেন ও তার সেবায় বিশেষ যত্নবান হন। ব্রাহ্মণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধহস্ত। তিনি দুর্বাসাকেও সন্তুষ্ট করতে পারেন, আবার মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাকে দেখা যায় ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দেবার কাজে নিযুক্ত হতে। 'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।'[৪২] ফলে বিদর্ভ থেকে যে ব্রাহ্মণ দ্বারকায় এসেছেন তার সেবায় কৃষ্ণকে নিযুক্ত করায় বেমানান হয়নি। তবে বহিরাঙ্গিক শিষ্টাচারের নেপথ্যে তিনি যেন কোনো সংবাদের প্রত্যাশা করছেন। 'ঠাকুর।

বলি বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের সম্বাদ জানেন, তিনি ভাল আছেন, তার পুত্র কন্যা সকলে ভাল আছেন?' (২য় অঙ্ক)

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ধনদাসের বিদর্ভে ফিরে আসার পর রুক্মিণীদের বিস্তর সাধ্যসাধনা করতে হয় মূল কথাটি উদ্ধারের জন্য। কিছুটা কৃত্রিম ভাবে নাটকের মধ্যে উৎকণ্ঠাকে জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ধনদাসের চরিত্রে।

রুক্মিণী : ঠাকুর, আপনার পায়েপড়ি, আর বিলম্ব করবেন না; সেখানে যে গেলেন, কি হল তাই বলুন।

ধনদাস : কিছুই হ-হল না, কে-কেবল ক-কর্মভোগ মাত্র।

লবঙ্গলতা : সেকি! কি বলেন আপনি –সাক্ষাৎ হয় নাই!

রুক্মিণী : পত্র দেওয়া হয় নাই। (৩/১)

নাটকের মূল কাহিনি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় পার্শ্বচরিত্রগুলি রঙ্গ-তামাসা করার সুযোগ পেয়েছে। ধনদাসের সরলতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণী বিধবা হয়েছেন বলে কৌতুকধন তামাসা করে নিচ্ছে। কৃষ্ণের নিকট চিঠি পৌঁছেদেওয়ার পুরষ্কার স্বরূপ রুক্মিণী ধনদাসের জীর্ণ বাড়ির জায়গায় নতুন দালান তুলে দিয়েছেন, ফলে দ্বারকা থেকে ফিরে এসে সে তার ঘর চিনতে না পেরে পথে বসে রোদন করছেন। ব্রাহ্মণী দুজন দাসীকে পাঠিয়েছেন তাকে ঘরে আনতে–

দ্বিতীয়া : ও ঠাকুর, ওখানে বসে কি কচ্চ? –আঁ–কথা কওনা কেন? –এসো না।

ধনদাস : কো-কোথায় যাব?

দ্বিতীয়া : ঐ যে, ঐ বাড়িতে চল না।

ধনদাস : আমি সে রীতের লোক নই। আ-আমাকে কেন?

দ্বিতীয়া : সে রীতের এ রীতের আবার কি? তোমাকে ডাকছেন যে। (৩/২)

তৎকালীন সময়ে পতিতালয়মুখী বেশ্যাসক্ত মিনসে চরিত্রের খণ্ডরূপের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নাট্যকার 'সে রীতের লোক' উচ্চারণের মাধ্যমে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে শ্যামা ও সোনা এই দুই দাসীর অনুপ্রবেশ নাটকের পক্ষে বাহুল্য। পূর্ব ঘটনারই পুনঃউল্লেখ নাটকের কলেবর বৃদ্ধি করেছে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতাররূপে উল্লেখকরা এ দুটি চরিত্র সৃজনের পেছনে ক্রিয়াশীল।

সোনা : শুনেছি তিনি নাকি ভগবানের অবতার।

শ্যামা : শ্রীকৃষ্ণ তো মনুষ্য নন, সাক্ষাৎ নারায়ণ।

. . . . . .

সোনা : শ্রীকৃষ্ণ এদেশে এলে এদেশ যে পবিত্র হবে। (৪/১)

রুক্মিণীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নাটকে ব্যোমযানের উল্লেখ রয়েছে, ভাগবতে স্পষ্টভাবেই রথের কথা বলা হয়েছে। নাট্যকারের নির্দেশনা, 'রুক্মিণী অম্বিকার মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে হঠাৎ আকাশ হইতে ব্যোমযান অবতরণ, কৃষ্ণ তাহা হইতে সত্বর নামিয়া রুক্মিণীর হস্ত ধারণ।' (৪/১)

ভাগবতের বর্ণনা : ''কৃষ্ণপদ ধ্যান করতে করতে রুক্মিণী পুরনারী ও সখীদের নিয়ে অম্বিকার মন্দিরে পূজাদি সমাপত করলেন। . . . শ্রীকৃষ্ণকে দেখে লজ্জাবতী কন্যা আনন্দিত ও আশ্বস্ত হলেন। রুক্মিণী যখন ফিরে যাবেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা তাঁকে আকর্ষণ করে নিজের রথে তুললেন এবং ঝড়ের বেগে বাইরে চলে গেলেন।''[৪৩]

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পরাজিত বিদর্ভ বাহিনীর সকলকেই একসঙ্গে দেখা যায়। শিশুপালের ভাই দন্তবক্র, সখা শাল্ব, শল্যের পুত্র রুক্মরথ, বিদূরথ ও জরাসন্ধকে রুক্মিণী হরণের প্রতিক্রিয়ায় বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। নারদীয় টিপ্পনীর সংযোজন মুণ্ডিত মস্তক রুক্মীর অপমানকে বর্দ্ধিত করেছে। মস্তকমুণ্ডন ও বলরামের দয়ায় রুক্মীর জীবন দান ভাগবতের অনুসারী। যতদিন অপমানের প্রতিশোধ না নিতে পারবেন ততদিন বিদর্ভ নগরীতে প্রত্যাবর্তন না করে যমুনারতীরে থাকার প্রতিজ্ঞা করেন। পৌরাণিক অভিধান অবশ্য নর্মদা নদীর কথা রয়েছে, ''ইনি নর্মদা তীরে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হন এবং লজ্জায় আর বিদর্ভে প্রত্যাবর্তন করেননি। নর্মদার নিকটে ভোজকট শহরে ইনি রাজত্ব করতে থাকেন।''[৪৪]

পরাজিত বিদর্ভ বাহিনীকে নারদ প্রতিশোধ গ্রহণের যে মন্ত্রণা দেন তা আপাতগ্রাহ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণেরই অনুকূলে, মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞে সে কথা প্রমাণিত হবে। যুধিষ্ঠিরের আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞের অর্ঘ্য শ্রীকৃষ্ণই পাবেন এবং সেখানে বিধ্বংসী বলরাম

উপস্থিত থাকবেন না, থাকলেও জ্যেষ্ঠর বর্তমানে কনিষ্ঠকে সম্মানিত করায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষ্ণের উপর প্রতিশোধ চরিতার্থ করার পরিকল্পনায় ভাগবত বা হরিবংশের রুক্মিণী হরণ বৃত্তান্তের সঙ্গে মহাভারতের অনিবার্য সম্পর্কের সেতু নারদীয় উক্তিতে নাট্যকার স্থাপন করেছেন।

পঞ্চমাঙ্কে দ্বারকাপুরীতে রুক্মিণীর নিকট পূর্ববর্তী বীরত্বের স্মৃতিচারণায় কৃষ্ণ প্রেয়সীর সান্নিদ্ধকেই মূল শক্তির প্রেরণা বলে স্তুতি করেছেন, 'তুমি সঙ্গে থাকাতে আমি চতুর্গুণ বলপ্রাপ্ত হয়েছিলেম।' মধুসূদনের কাব্যেও অর্জুনকে এমনিভাবে বলতে শোনা যায় -

''আশারূপে মোরপাশে দাঁড়াও রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি''[৪৫]

'দেবদম্পতি দেহি মোক্ষং' বলে করজোড়ে প্রণিপাত করার জন্য যুগলরূপ দর্শনের জন্য নাটকের শেষে রুক্মিণীর সখীদ্বয়কে নাট্যকার পুনরার ডেকে এনেছেন।

রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে এই নাটকটি বিশেষ উল্লেখ্য বলে নাট্যসমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। ''পৌরাণিক নাট্যকারের যে ভক্তিভাব, পুরাণ বিশ্বাস ইত্যাদি থাকা দরকার বাস্তব জীবনের রূপকার রামনারায়ণের মধ্যে সেই গুণ 'রুক্মিণীহরণ' নাটক ব্যতীত অন্যত্র তেমন প্রকাশ পায়নি।''[৪৬] পৌরাণিক চরিত্রগুলি নাটুকে রামনারায়ণের হাতে লৌকিক বাস্তব রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নান্দী সূত্রধারবর্জিত মিলনান্তক এই নাটকটির ভাষা সাধু গদ্যও নয় আবার গ্রাম্য ভাষাও নয়। সংস্কৃত শব্দবর্জিত সংলাপ নাটকের গতিকে অব্যহত রেখেছে।

রামনারায়ণের পুরাণনির্ভর নাটক গুলির মধ্যে 'কংসবধ নাটক'(১৮৭৫) ও 'ধর্মবিজয় নাটক' (১৮৭৫) –এর সঙ্গে মহাভারতের সংযোগ পরোক্ষ। মূলত হরিবংশ ও ভাগবতের অনুসরণে

এই দুটি নাটক রচিত। মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা অংশে কংসবধের কথা উচ্চারিত হয়েছে –

''ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার।
. . . .
কংসেরে মারিল যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে।''[৪৭]

কংসবধ নাটকে রামনারায়ণ ভাগবতের অনেক অংশ বর্জন করেছেন এবং কিছু নতুন ঘটনাও সংযোজন করেছেন। এই নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব নেই বললেই চলে।

হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে রচিত ধর্মবিজয় নাটকের মূল উৎস 'দেবীভাগবত'। মহাভারতে সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের কথা উল্লেখিত হয়েছে –

''শ্রীকৃষ্ণ বলেন হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তথা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ।।''[৪৮]

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদেও কেবল হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের প্রশংসাই বর্ণিত হয়েছে –

''রাজা হরিশ্চন্দ্র সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন। তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রভাবে সপ্ত-দ্বীপ জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন।''[৪৯]

শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় এবং নিদারুণ শ্মশান দৃশ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই নাটকের কোন উল্লেখ মহাভারতে নেই। নাটকটি সম্পর্কে সুশীলকুমার দে-র বক্তব্য -

''ধর্মবিজয় নাটকের নাট্যবস্তু নির্মাণে নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা থাকিলেও বৈচিত্র্য নাই, এবং রামনারায়ণের অন্যান্য নাটকের মত সুলিখিত নয়। সর্বকার্যের বিঘ্নকারক বিঘ্নরাট্ ও বিদ্যাত্রয়-সিদ্ধির পরিকল্পনা চণ্ডকৌশিক হইতে গৃহীত। যবনধর্মী দুস্প্রতাপ, পাপপুরুষ প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টিতে নূতনত্বের চেষ্টা আছে, কিন্তু এক শ্মশানদৃশ্য ভিন্ন কোন দৃশ্যই মনোরম হয় নাই। বিশ্বামিত্রকে একটি খিটখিটে সাধারণ রাগী বামুনের মত করিয়া গড়া হইয়াছে। ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিকের প্রভাব সুস্পষ্ট।''[৫০]

নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধর ধর্মবিজয়কে শান্তরসের নাটক বলে দাবি করলেও তা বিবেচনার বিষয়।

তথ্যসূত্র :

১. জগদীশচন্দ্র তর্কতার্থ (সম্পা.): 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার' ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮৬, নবপত্র, ১৯৭৮

২. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', 'স্ত্রীপর্ব' পৃ: ৯৫১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত '(১ম খণ্ড), পৃ: ৮৩১-৮৩২, তুলি কলম, ৮ম সংস্করণ, ২০০৮

৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৮৩৫, ঐ

৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৮৩৬, ঐ

৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, পৃ: ৮৩৭, ঐ

৭. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খণ্ড), স্ত্রীপর্ব, পৃ:৫৩০ তুলি কলম, ৮ম সংস্করণ, ২০০৮

৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ঐ, 'শান্তিপর্ব', পৃ: ৫৪২, ঐ

৯. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', 'আদিপর্ব', পৃ:১৭৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১০. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', 'দ্রোণপর্ব', পৃ:৭৯৬, ঐ

১১. জগদীশচন্দ্র তর্কতার্থ (সম্পা.) : 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮২, নবপত্র, ১৯৭৮

১২. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খণ্ড), 'কর্ণপর্ব', পৃ: ৩৯২, তুলি কলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১৩. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৮৮৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০১৩

১৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :'শকুন্তলা', ভূমিকা অংশ। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনিকান্ত দাস সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৯

১৫. রামনারায়ণ তর্করত্ন : 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক', ভূমিকা অংশ। 'হারানো দিনের নাটক' (পিনাকেশ সরকার সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৯।

১৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', 'আদিপর্ব', পৃ:৫৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০১৩

১৭. কাশীরাম দাস : ঐ

১৮. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', 'আদিপর্ব', পৃ: ৫৪, ঐ

১৯. সুরেশচন্দ্র মৈত্র : 'বাংলা নাটকের বিবর্তন', পৃ: ১৯২, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

২০. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), আদিপর্ব, পৃ: ১২৩, তুলি কলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২১. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', 'আদিপর্ব', পৃ: ৫৪, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

২২. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের লঘুগুরু', পৃ: ৩০৯, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২

২৩. বীরেশ্বর মিত্র : 'বিশ্ব মহাকাব্য প্রসঙ্গ', (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, দ্বিতীয় সর্গ, শ্লোক-১৫) পৃ:২৬৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫

২৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিজিতকুমার দত্ত (সম্পা.) : 'সাহিত্য-সম্পুট', (দুর্বাসার শাপ) পৃ: ৮২, বিশ্বভারতী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২

২৫. রবীন্দ্রনাথ : 'প্রাচীন সাহিত্য', 'শকুন্তলা', পৃ: ১৩৯, ঐ

২৬. রবীন্দ্রনাথ : ঐ

২৭. মাইকেল মধুসূদন দত্ত : 'বীরাঙ্গনা কাব্য', পৃ: ৪, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

২৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ঐ, পৃ: ৫-৬, ঐ

২৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বঙ্কিম রচনাবলী' (২য় খণ্ড), পৃ: ৩৫৫, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯

৩০. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সম্পা.) : 'কোরক', মহাভারত সংখ্যা, পৃ: ১৭০, শারদীয় ২০১৪

৩১. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের যুদ্ধ ও কৃষ্ণ', পৃ: ৩৩ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, নবম মুদ্রণ, ১৪২০

৩২. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী, পৃ: ৬৪৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪

৩৩. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৩১৮, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৩৪. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের অষ্টাদশী', পৃ: ৬৪২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪

৩৫. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের লঘুগুরু' পৃ: ২১১, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২

৩৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত, পৃ: ৩১৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৩৭. ড. অজিতকুমার ঘোষ : ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, পৃ: ৬৬ দে’জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

৩৮. মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’, পৃ: ১৬, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

৩৯. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : মহাভারতের অষ্টাদশী, পৃ: ৬৪১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৪

৪০. ভবানীগোপাল সান্যাল : ‘বীরাঙ্গনা কাব্যের ভূমিকা’, পৃ: ৩৫, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

৪১. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক’, পৃ: ৮৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১

৪২. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ‘মহাভারত’ (১ম খণ্ড), পৃ: ৩১৫, তুলি কলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৪৩. স্বামী অমলানন্দ (সম্পা.) : ‘ভাগবতের কথা ও গল্প’, পৃ:১১০-১১১, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেন্টস্ হোম, ১৭তম মুদ্রণ, ২০১৩

৪৪. সুধীরচন্দ্র সরকার : ‘পৌরাণিক অভিধান’(সংকলিত), পৃ: ৪৭৫, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, দশম সংস্করণ, ১৪১৮,

৪৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত : ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, পৃ; ৩৩,মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

৪৬. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক’, পৃ: ৮৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১

৪৭. কাশীরাম দাস : ‘মহাভারত’, ‘আদিপর্ব’, পৃ: ৩১৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৪৮. কাশীরাম দাস : ঐ, পৃ: ২৮৭, ঐ

৪৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ : ‘মহাভারত’ পৃ: ২৯৪, তুলি কলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৫০. পিনাকশ সরকার (সম্পা.) : ‘হারানা দিনর নাটক’, ভূমিকা- পৃ: ৩৮, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯